সা ত দি ন

১০ সেপ্টেম্বর: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে স্পর্শকাতর এলাকায় অবিলম্বে সেনা মোতায়েনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

নির্বাচনী সংঘাত-সংঘর্ষে ভোলা, ফেনী, বরিশাল, মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকায় ৯ ব্যক্তি নিহত এবং প্রায় ৭০ শতাধিক লোক আহত হয়েছেন।

১১ সেপ্টেম্বর : যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় অনেক বাংলাদেশী নিহত। নির্বাচনী সহিংসতায় ফেনী, ফটিকছড়ি ও ময়মনসিংহে ৫ জন নিহত হন।

১২ সেপ্টেম্বর : প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আসন্ন নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনা মোতায়েনের প্রক্রিয়া গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিন বাহিনী প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভোলায় আওয়ামী লীগ ও চারদলীয় জোটের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে আওয়ামী লীগের ২ জন এবং বিএনপির ৩ জনকর্মী নিহত হয়েছেন।

১৩ সেপ্টেম্বর : বিএনপি চেয়ার পার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে এসএসএফ নিরাপত্তা প্রদান শুরু।

দেশে তৈরি ২৬টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ঢাকায় ২ যুবক গ্রেপ্তার।

১৪ সেপ্টেম্বর : সন্ত্রাস, দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ১৭ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা।

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে আওয়ামী লীগ-বিএনপি ব্যাপক সংঘর্ষে ১ জন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত।

১৫ সেপ্টেম্বর : প্রধান উপদেষ্টা ও সিইসির সঙ্গে ডিসি-এসপিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংবাদপত্র শিল্পকে চরম সংকট থেকে বাঁচানোর জন্য প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমানের কাছে লিখিত আবেদন জানায়, বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ।

১৬ সেপ্টেম্বর : প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমান বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাত-সহিংসতার জন্য রাষ্ট্রপতি অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়ী নয়। এর দায় সংশ্লিষ্টদের।

নির্বাচনী সহিংসতায় সারাদেশে ৫ জন নিহত ।

সহিংসতা ও সেনাবাহিনী

দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য প্রধান দুই রাজনৈতিক দলই দায়ী। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই দলের পক্ষ থেকেই কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসী প্রার্থীকে দেয়া হয়েছে মনোনয়ন। প্রতিপক্ষ দল দুটো সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে এবং কালো টাকাকে কালো টাকা দিয়ে ঠেকাতে চেয়েছে। এ কারণেই বেড়েছে রাজনৈতিক সহিংসতা। এখন সহিংসতার দোষ একে অপরের ওপর চাপাতে চেষ্টা করছে। নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন নিয়ে সৃষ্টি করছে ধুম্রজাল... লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়েই চলছে। নির্বাচনী সহিংসতায় শতাধিক লোক ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সহিংসতা বন্ধের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে চাপ দিয়ে চলছে। চারদলীয় জোট সহিংসতা বন্ধের জন্য পনেরো তারিখের মধ্যেই সারা দেশে সেনা মোতায়েনের দাবি জানিয়েছে।

আর কত কাঁদবে মানুষ

জোটনেত্রী বক্তৃতায় বলেছেন, সারা দেশে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে আইন-শৃঙ্খলার দ্রুত উন্নতি করতে হবে। আর একটা লাশ পড়লে দায়ী থাকবেন রাষ্ট্রপতি। আওয়ামী প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে সেনা মোতায়েনের বিরোধিতা করে চলছে। সেনা মোতায়েন বিলম্ব করার জন্য তারা রাষ্ট্রপতির কাছে বার বার ছুটে যাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান লতিফুর রহমান সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর, নির্বাচনী জনসভায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, খালেদা জিয়া ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার একই সুরে কথা বলছেন। নির্বাচনে সেনাবাহিনী নিয়োগ নিয়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ঘোলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তবে রাষ্ট্রপতি স্পর্শকাতর এলাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। আগামী ২২ সেপ্টেম্বরের পরে সব নির্বাচনী এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হবে।

দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য প্রধান দুই রাজনৈতিক দলই দায়ী। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই দলের পক্ষ থেকেই কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসী প্রার্থীকে দেয়া হয়েছে মনোনয়ন। প্রতিপক্ষ দল দুটো সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে এবং কালো টাকাকে কালো টাকা দিয়ে ঠেকাতে চেয়েছে। এ কারণেই বেড়েছে রাজনৈতিক সহিংসতা। এখন সহিংসতার দোষ একে অপরের ওপর চাপাতে চেষ্টা করছে।

আওয়ামী লীগ নেত্রী লালবাগে হাজী সেলিমের নির্বাচনী জনসভায় তার হাতে নৌকা প্রতীক তুলে দিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছেন। আর জোটনেত্রী খালেদা জিয়া আজিমপুরে নাসিরউদ্দীন পিন্টুকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সন্ত্রাস নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ তাদের মাধ্যমে এলাকায় সন্ত্রাস যে দমন হবে না তা অবুঝ বালকও বুঝতে পারে। সন্ত্রাস দমনে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের আন্তরিকতায়ই বড়। সেনাবাহিনী নিয়োগ ও নিয়োগের বিরোধিতা না করে সন্ত্রাসীদের মদদ দেয়া বন্ধ করলে এমনিতেই নির্বাচনে সহিংসতা হবে না।

সেনাবাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে বিএনপি অতি উৎসাহী মনোভাব যেমন সন্দেহের জাল বুনিয়েছে, তেমনি আওয়ামী লীগের বিরোধিতাও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তবে সাধারণ জনগণ চায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন। সেনাবাহিনী নিয়োগ করে এ পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে শান্তিপ্রিয় জনগণ তার পক্ষে। গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ এখন চেয়ে আছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনী পরিবেশের দিকে। এ পরিবেশ তাদের ভোট দেয়ার নিশ্চয়তা দেবে।

শাবাশ বাংলাদেশ

ভবিষ্যতে যারাই নির্বাচনী প্রচারণায় ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করবে তাদের অনেক কিছু লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে এমন কিছু যেন না প্রচার করা হয় যাতে তার সামাজিক অবস্থা ক্ষুণ্ন হয় এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়... লিখেছেন শারদ রহমান

শাবাশ বাংলাদেশ। বিতর্কিত নির্বাচনী প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি এক দলের কাছে নন্দিত হলেও প্রতিপক্ষকে বিক্ষুব্ধ করেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে এই প্রথম দলীয় নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হলো। অনুষ্ঠানটি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাদের সমর্থকেরা প্রতিবাদ করেছে এমনকি আদালতে মামলাও করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে তারাও 'জয় বাংলার জয়' নামে অনুরূপ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করেছে। তাই নির্বাচনী প্রচারণায় 'শাবাশ বাংলাদেশ' এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

শাবাশ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ শাসনামালের ব্যর্থতাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী ও সাংসদদের ছেলেদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলো উপস্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য প্রচার করে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চলছে। যেহেতু এটা নির্বাচনী প্রচারমূলক অনুষ্ঠান তা তারা করতেই পারেন। কিন্তু যাদের দোষী দেখানো হয়েছে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদেরও বক্তব্য নেওয়া উচিত ছিল। এটা না করায় অনেকটা নীতিবিরোধী কাজ হয়েছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ না করে এটিএন বাংলা ভবনে বোমা-বর্ষণ ও শাবাশ বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের হুমকির মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করেছে। এছাড়া যারা এই অনুষ্ঠানটিকে নীতিবিরোধী বলে গাল-মন্দ করেছে, তারাই আরেকটি অনুষ্ঠান নির্মাণ করে প্রতিপক্ষের চরিত্র হননের চেষ্টা চালিয়েছে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এই প্রথমবার নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর যে ধারা শুরু হলো আগামী ২০০৬ সালের নির্বাচনে এর ব্যাপকতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। তখন হয়তো এ কারণে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে নতুন বিধি প্রণয়ন করতে হবে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে সরাসরি সমালোচনা যা তাদের বিক্ষুব্ধ করতে পারে তা না করে দলীয় প্রচারণা এবং প্রতিপক্ষের ব্যর্থতা তুলে ধরা যেতে পারে। উন্নত দেশগুলোর সাধারণ নির্বাচনে এ ধরনের অনুষ্ঠান নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকে আবার মনে করেন, রাজপথ আটকে মিছিল -সমাবেশ করে জনভোগান্তি না বাড়িয়ে এভাবে তাদের বক্তব্য প্রচার করতে পারে। কেননা, বাংলাদেশে এখন ২৫ শতাংশ টিভি নেটওয়ার্কের আওতায় চলে এসেছে। এছাড়া অনেক প্রার্থী শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ন্যায় দৌড়ঝাঁপে অক্ষম হতে পারে, তাই তারা এর মাধ্যমে ভোটারদের কাছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করবে।

ভবিষ্যতে যারাই নির্বাচনী প্রচারণায় ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করবে তাদের অনেক কিছু লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে এমন কিছু যেন না প্রচার করা হয় যাতে তার সামাজিক অবস্থা ক্ষুণ্ন হয় এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক দেশে মত প্রকাশের অধিকার সবার আছে। কিন্তু মত প্রকাশ করতে গিয়ে যেমন গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করা চলবে না তেমনি গায়ের জোরে অন্যকে কথা বলতে দেবো না এটাও মেনে নেওয়া যায় না।

শাবাশ বাংলাদেশ প্রচার হওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে এর নির্মাতা মাহি চৌধুরী বলেন, যেহেতু একটি দলীয় অনুষ্ঠান তাই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কোনো ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত কিছু করা হয়নি। সন্ত্রাস আওয়ামী লীগের সময় ব্যাধিতে রূপ নিয়েছিল, তাই ঐ সময় সন্ত্রাসী ঘটনায় পত্র-পত্রিকায় যাদের নাম এসেছে তাদের সম্পর্কেই দেখানো হয়েছে। শাবাশ বাংলাদেশ নিজ থেকে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করেনি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল অনুষ্ঠানটি প্রচার হওয়ার পর এটিএন বাংলায় বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে। ফলে প্রচার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে বিজ্ঞাপন খরচ কমে গেছে বলে মাহি জানান। তিনি বলেন 'শাবাশ বাংলাদেশ' যে যাত্রা শুরু করলো আগামীতে এই পথ ধরে অনেককেই চলতে হবে।

নির্বাচনের সামনে জামিন

চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী ওয়ার্ড কমিশনার মামুনুর রশীদ মামুন জননিরাপত্তা আইন মামলাসহ ২১টি মামলায় হাইকোর্ট থেকে গত ৩ সেপ্টেম্বর জামিন পায়। তবে ১৭তম মামলায় এখনো হাজতে রয়েছে মামুন। সাধারণ মামলায় আটক থাকলেও যে কোনো সময় জামিন পেতে পারে এ মামলায়। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সহকারী কমিশনার মোঃ মনিরুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'যে মামলাতেই জামিন হোক ৫৪ ধারায় আবার তাকে জেল গেটেই গ্রেপ্তার করা হবে। নির্বাচন পর্যন্ত কোনো সন্ত্রাসীকেই ছাড়াবার বিধান আমাদের নেই।'

উল্লেখ্য, গত ১৮ এপ্রিল ২০০১ বুধবার গভীর রাতে মদ্যপ মামুন চট্টগ্রামের স্থানীয় দৈনিক পূর্বকোণ অফিসে তার রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সংবাদ ছবিসহ প্রথম পাতায় ছাপানোর দাবিতে সিনিয়র ক'জন সাংবাদিককে আক্রমণ করে। এরপর দেশ জুড়ে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের চাপে মামুন নিজেই ধরা দেয় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। এ দিকে নগরীর আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী পাহাড়তলী কলেজ, ফিরোজ শাহ কলোনির সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রক ডন-সম্রাট গ্রুপের অন্যতম প্রধান রহমত উল্লাহ্ ডনও জামিন পেয়ে যায় এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। মাসখানেক আগে নগরীর খুলশী থানা পুলিশ অস্ত্রসহ ডনকে গ্রেপ্তার করে। তবে ৫৪ ধারায় তাকেও এখনো হাজতে রাখা হয়েছে।

ছাত্রদল নেতা রহমতউল্লাহ ডনকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের কেউ কেউ সরাসরি তদ্বির করলেও তাকে নির্বাচনের পূর্বে ৫৪ ধারায় কারান্তরীণ রাখবার বিধানের কারণে জামিন হয়নি। গত ১৬ সেপ্টেম্বর লালদীঘি ময়দানে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সমাবেশে মঞ্চ থেকে ছাত্রদল নেতা শীর্ষ সন্ত্রাসী ডন-এর মুক্তির দাবি জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত ১৬ সেপ্টেম্বরের এ সমাবেশ থেকে ডন, সম্রাট, জসীম, জায়েদ ইকবাল, মোর্শেদ খানের মুক্তি দাবি করা হয়– এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট সন্ত্রাসের অভিযোগ থাকবার পরও প্রকাশ্যে এদের মুক্তি দাবি রাজনৈতিক দল সমূহের হঠকারীতার প্রকাশ বলে অনেকে মন্তব্য করেন। তবু এদের নিয়েই ক্ষমতায় যাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল।

সুমি খান

টিটোর পদত্যাগ বিপদে তরিকুল

এক রাজ্যে ২ রাজা থাকলে যা হয় তাই হয়েছে। এক মঞ্চে বসে ২ নেতা হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ আর বক্তৃতা দিলেও গোপনে চেষ্টা করেছেন একে অপরকে ঘায়েল করতে। সুসংহত হওয়ার পরিবর্তে যশোর বিএনপি'র রাজনীতি বিভক্ত হয়ে যায় শক্তিশালী দু'টি ভাগে। যার এক পক্ষে ছিলেন তরিকুল আর অপর পক্ষে টিটো... লিখেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

খালেদুর রহমান টিটো ও তরিকুল ইসলাম দক্ষিণ বঙ্গের দু'শীর্ষ রাজনীতিবিদ। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও তাদের অবস্থান সুসংহত। দু'ধারার রাজনীতিতে থেকে দু'জনই পেয়েছেন কম-বেশি সাফল্য। জাতীয় পার্টির আমলে খালেদুর রহমান টিটো মন্ত্রী হয়েছিলেন। তারপর এরশাদ কারাগারে গেলে তিনি হন মহাসচিব। অবিচ্ছেদ্য জাপার ৩ বছর মহাসচিব ছিলেন তিনি।

আর তরিকুল ইসলামের অর্জনও কোনো অংশে কম নয়। বিএনপি'র শাসনামলে পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও তিনি বিএনপি'র নীতি-নির্ধারকদেরও অন্যতম একজন। যশোরে দু'জনের জনপ্রিয়তাও প্রায় সমান। গত নির্বাচনের ফলাফল অন্তত তাই বলে। বড় দলের প্রার্থী তরিকুল ইসলাম ভোট পেয়েছিলেন ৬৫ হাজার। আর বিধ্বস্ত জাতীয় পার্টির প্রার্থী টিটো পেয়েছিলেন ৬৩ হাজার ভোট। বলা যায় এর সিংহ ভাগই টিটোর রিজার্ভ ভোট। সম্ভবত 'এক রাজ্যে দু'রাজার বসবাস অসম্ভব' বলেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও দু'জন এক কাতারে শামিল হতে পারেননি। নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই শাসন করেছেন 'সাম্রাজ্য'। আর এ কারণেই যশোরে এমন আলাপ-আলোচনাও হতো 'দুই বন্ধু যদি এক কাতারে শামিল হন তাহলে কেমন হতো? তা দেখার সৌভাগ্যও হয়েছিল যশোরবাসীর। দু'বন্ধু এক দলের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন ১৯৯৭ সালে। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ টিটোকে মহাসচিবের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুরকে মহাসচিব নিয়োগ করলে টিটো ক্ষোভে দলত্যাগ করে ঐ বছরের ১৯ মে বিশাল কর্মী-সমর্থক নিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন। বিএনপি অনেকটা যেচেই দলে ভিড়িয়েছিল টিটোকে। এর পেছনে যুক্তিও ছিল। আর তাহলো– আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে চিহ্নিত যশোরে ফাটল ধরানো। পার্শ্ববর্তী জেলা ঝিনাইদহের ৪টি আসনই বিএনপি লাভ করলেও যশোরে পায়নি একটিও। এমনকি তরিকুল ইসলাম তার চেয়ে অনেক অখ্যাত ও সদ্য বিএনপি ত্যাগী আওয়ামী লীগের প্রার্থী আলী রেজা রাজুর কাছে হেরে যান ১০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে। আর এ জন্যেই বিএনপি টিটোকে দলে ভিড়িয়ে সদরের অবস্থান সুসংহত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ২ বন্ধু এক হলে কেমন হত যশোরবাসী গত ৪ বছর তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

এক রাজ্যে ২ রাজা থাকলে যা হয় তাই হয়েছে। এক মঞ্চে বসে ২ নেতা হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ আর বক্তৃতা দিলেও গোপনে চেষ্টা করেছেন একে অপরকে ঘায়েল করতে। সুসংহত হওয়ার পরিবর্তে যশোর বিএনপি'র রাজনীতি বিভক্ত হয়ে যায় শক্তিশালী দু'টি ভাগে। যার এক পক্ষে ছিলেন তরিকুল আর অপর পক্ষে টিটো। তবে টিটো যোগ দেয়ায় যে যশোর বিএনপিতে গ্রুপিং লবিং সৃষ্টি হয় তা নয়। যশোরে বিএনপি দ্বিধা বিভক্ত ছিল অনেক আগে থেকেই। দলত্যাগ করে টিটো এখন যেমন বলছেন তরিকুল সন্ত্রাসী চোরাচালানিদের গডফাদার। এ অভিযোগ আগেও তার বিরুদ্ধে ছিল। আর সে অভিযোগ করতো বিএনপিরই একটি অংশ। যারা স্বচ্ছ রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, টিটো যোগ দেয়ায় এই অংশ নতুন শক্তি পেয়ে যায়। তারা আরো সোচ্চার হয়ে ওঠেন তরিকুল ইসলাম গ্রুপের বিপক্ষে। বলা যায় এই গ্রুপটিই দলে শক্তিশালী ছিল, যা অনুভব করতে সময় লাগেনি তরিকুল

'কি হবে? লাশ পড়বে? পড়লে পড়বে! সন্ত্রাসের কাছে আমি মাথানত করতে রাজি নই'

খালেদুর রহমান টিটো

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিএনপি থেকে পদত্যাগ করলেন কেন?

টিটো : একটি মহান আদর্শকে সামনে রেখেই আমি বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যশোরকে একটি বাসযোগ্য স্থানে পরিণত করা। এজন্যে আমার প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম। যেখানে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু বলা যায়, করা যায়। আর সে জন্যেই বিএনপির মত একটি বড় দলে যোগ দিয়েছিলাম। আমার প্রথম লক্ষ ছিল দল থেকে সন্ত্রাসী, চোরাচালানি ও দুর্বৃত্তদের বহিষ্কার করা। যাতে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের শেল্টার না পায়। আর তা হলে আমি যশোরকেও সন্ত্রাস মুক্ত করতে পারতাম। আমি যখন আমার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম তখন আমি তাদের সে প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলাম। কিন্তু তা যখন হল না তখন সে দলে থেকে আর লাভ কী?

২০০০ : আপনি ব্যর্থ হলেন কেন?

টিটো : প্রথমে আমি চেয়েছিলাম দলকে চোরাচালানি ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে। এ ব্যাপারে আমি সিংহ ভাগ নেতা-কর্মীর সমর্থনও পেয়েছিলাম। কিন্তু তা হতে দেননি একজন প্রভাবশালী নেতা।

২০০০ : দলত্যাগ করার পর আপনি বিভিন্ন সমাবেশে বলেছেন, অনেক খুনের নেপথ্য নায়ক, সন্ত্রাসী ও চোরাচালানিদের গডফাদার এক নেতার কারণেই আপনি দল থেকে চোরাচালানি ও সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করতে পারেননি। কিন্তু সেই নেতার নাম বলছেন না কেন?

টিটো : এখানে নাম বলা আর না বলা

ইসলামের। যে কারণে তিনিও আস্তে আস্তে নিজের অবস্থান আরো পাকাপোক্ত করার অভিযানে নেমে পড়েন। যাতে তিনিই সফল হন। যশোর-৩ আসনে দলীয় মনোনয়ন লাভ তারই প্রমাণ। টিটোকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তাকেই যশোর-৩ আসনে মনোনয়ন দেয়া হবে। কিন্তু খালেদা জিয়া শেষ পর্যন্ত তার কথা রাখতে পারেননি। তরিকুল ইসলামের চালের কাছে হেরে যান টিটো। আর তাতেই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বিশাল কর্মী-সমর্থক নিয়ে দল ত্যাগ করেন টিটো। তার দল ত্যাগ রোধ করার জন্যে দলীয় মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়াসহ আরো অনেক শীর্ষ নেতাই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিএনপি নেত্রীর আচরণে চরম ক্ষুব্ধ টিটোকে তারা থামাতে পারেননি। দল ত্যাগ করে তিনি বলেন, খালেদা জিয়া কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের গডফাদার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন এবং নির্বাচনে তাদেরকেই মনোনয়ন দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার পরিবর্তে দল যাকে মনোনয়ন দিয়েছে সেই তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন– তার এ যুদ্ধ কালো টাকার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে । এ যুদ্ধে জিততে তিনি আসন্ন নির্বাচনে তরিকুল ইসলামের বিপক্ষ শক্তিশালী যে কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবেন।

দুই বন্ধু তরিকুল-টিটো কিছুদিন আগেও ছিল এক ছাতার নিচে

টিটো বলেন, যে প্রার্থীর পক্ষে কাজ করলে তরিকুল হারবে আমি তার পক্ষেই কাজ করবো। তার এ অবস্থান চরম বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে তরিকুল ইসলামকে। কারণ টিটো এমনি একজন নেতা যার রয়েছে বিপুল সংখ্যক রিজার্ভ ভোট। তিনি যাকেই বলবেন ঐ ভোটের সিংহ ভাগ সেই প্রার্থীর বাক্সেই যেতে পারে। আর তা যদি হয় তাহলে মনোনয়ন লাভের যুদ্ধে তরিকুল জিতলেও ভোটের যুদ্ধে টিটোর কাছে তিনি হেরে যেতে পারেন। কারণ তরিকুল ইসলামকে এখন শুধু তার শক্ত ২ প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের আলী রেজা রাজু ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আজকের কাগজ সম্পাদক কাজী শাহেদের বিরুদ্ধেই লড়তে হচ্ছে না, তাকে লড়তে হচ্ছে টিটো ও তার উত্থাপিত অভিযোগের (অসংখ্য খুনের নেপথ্য নায়ক, কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসী-চোরাকারবারীদের গডফাদার) বিরুদ্ধে। এ ছাড়াও তার মাথার ওপর খাড়া হয়ে আছে আরো বড় দু'টি জঘন্য অভিযোগ। তাহলো– সাংবাদিক সাইফুল আলম মুকুল ও উদীচী হত্যাযজ্ঞ মামলা। যশোরের বর্বর এ হত্যাযজ্ঞ দুটিরই তিনি চার্জশিটভুক্ত আসামি। যা তার প্রতিপক্ষরা কাজে লাগাচ্ছে। নির্বাচনে যদি এর বিরূপ প্রভাব পড়ে তাহলে তরিকুল ইসলামের জয়ী হওয়া কঠিন হয়ে যাবে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে যদি তিনি ঘৃণার পরিবর্তে সহানুভূতি পান। কারণ তরিকুল ইসলাম বর্বর ঐ হত্যাযজ্ঞ দু'টির আসামি হলেও অনেকেই মনে করেন তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার। যশোরে তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্যে সাবেক সরকারই তাকে ঐ মামলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফলে আসন্ন নির্বাচনে তাকে জয়ী করে বিএনপি'র হাতকে শক্তিশালী করতে পারলেই কেবল তিনি রক্ষা পেতে পারেন। কিন্তু টিটো পক্ষের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, তা হতে দেবেন না তারা। তরিকুলকে হারানোর জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন তারা। এর পেছনে আরো একটি কারণও আছে। তাহলে–টিটো আবার বিএনপিতেই ফিরে আসবেন। তবে তা হবে কেবল তরিকুল ইসলাম হারলেই।

সমান কথা। আমি কি বলছি, কাকে বলছি তা বুঝতে কারো বাকি নেই।

২০০০ : লোকে কিন্তু বলছে তরিকুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করেই আপনি এসব বলছেন?

টিটো : অবশ্যই। কে না জানে তার ভূমিকা। নুরউন-নবী হাসান কোন দল করে, কে তাদের লালন- পালন করে তা সবাই জানে। এতে নতুন করে বলার কিছু নেই। আমি মনোনয়ন না পাওয়ায় সন্ত্রাসীরা উল্লাস প্রকাশ করে কি কারণে?

২০০০ : খালেদা জিয়া কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন– এমন কথাও আপনি বলেছেন?

টিটো : অবশ্যই তাই। আমাকে দলে নেয়া হয়েছিল সদর আসনে মনোনয়ন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই। কিন্তু তিনি কথা রাখতে পারেননি। আমার পরিবর্তে কাকে মনোনয়ন দিয়েছে তা পর্যালোচনা করলেই আমার বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

২০০০ : কিন্তু আপনি তো আগে এসব বলেননি। এখন অনেকেই বলছেন দল থেকে মনোনয়ন না পেয়েই আপনি অপপ্রচার শুরু করেছেন?

টিটো : তা হয়তো কেউ বলতে পারে। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। আমি আগেই বলেছি, বেগম জিয়া আমাকে সদর (যশোর-৩) আসনে মনোনয়ন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ঐ সময় তার বাসায় তারেক জিয়াসহ একজন পত্রিকার সম্পাদকও উপস্থিত ছিলেন।

২০০০ : আপনাকে তো অন্য আসনে মনোনয়ন দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

টিটো : এটা তো হতে পারে না। আমি তো একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই (চোরাচালান ও সন্ত্রাস দমন) বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম যেখানে থাকি সে স্থানটাকে বসবাসের যোগ্য করে তুলতে। অন্য আসন থেকে এমপি হলে তাতো সম্ভব হতো না। আমি মনে করি আমার রাজনৈতিক জীবনের মৃত্যু ঘটে গেছে। আর অন্য আসন থেকে মনোনয়ন নিলে আমি পচে যেতাম। আমি দুর্গন্ধময় জীবন চাইনি। এ জন্যেই অবসর নিয়েছি।

২০০০ : শোনা যায় যশোর-৩ আসনে আওয়ামী লীগ আপনাকে প্রার্থী করতে চেয়েছিল।

টিটো : রাজু (আওয়ামী লীগের প্রার্থী) আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে হটিয়ে আমি প্রার্থী হব এটা হতে পারে না। এটা অন্যায়।

২০০০ : যশোরে আপনার বিশাল ভোট

ব্যাংক আছে। শোনা যাচ্ছে তরিকুল ইসলামকে হারাতে আপনি রাজু'র পক্ষে কাজ করবেন।

টিটো : কার পক্ষে কাজ করবো তা আমি এখনি বলছি না। তবে যে প্রার্থীর পক্ষে কাজ করলে তরিকুল ইসলাম হারবে আমি তার পক্ষেই কাজ করবো।

২০০০ : অনেকেই বলছেন, নির্বাচনের পর আপনি আওয়ামী লীগে যোগদান করবেন।

টিটো : আমি তো রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছি। তাহলে আওয়ামী লীগে যোগ দেব কেমন করে! তাছাড়া আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে আমি তো কোনো পার্থক্য দেখি না। দু'টি দলই একই চরিত্রের।

২০০০ : আপনি বলেছেন সাংবাদিক সাইফুল আলম মুকুল ও শামছুর রহমান হত্যাকান্ডের নেপথ্য নায়কও যশোরের একজন গডফাদার (তরিকুল ইসলামকে ইঙ্গিত করে), যিনি শামছুর রহমানের খুনি পাগলা সেলিমকে ভারতে আটকে রাখতে ২ লাখ টাকা খরচ করেছেন।

টিটো : বিষয়টি আসলে এরকম। আমি মনে করি মুকুল হত্যাকান্ডে চোরাচালান সিন্ডিকেট জড়িত। সিন্ডিকেটের হর্তাকর্তাদেরকে শেল্টার দিত নুর-উন। নবীকে কে নেতা বানিয়েছে, তা কে না জানে! তাহলে শেল্টারদাতারা কিভাবে এই হত্যার দায় এড়াবে আর শামছুর রহমানকে কারা হত্যা করেছে তা আমি জানি না। তবে তার মামলার চার্জশিটভুক্ত প্রধান আসামি পাগলা সেলিম সম্পর্কে জানি। যশোরবাসীও জানে। সে যুবদল করতো। প্রভাবশালী এক নেতার শেল্টারে থাকতো। তাহলো সে যদি কোনো হত্যাকান্ড ঘটায় তাহলে তার দায়দায়িত্ব কি শেল্টারদাতার ঘাড়ে বর্তায় না?

২০০০: বড় একটা দলে থেকেও আপনি সন্ত্রাস দমন করতে পারলেন না। এখন তো কোনো প্লাটফর্মেও নেই। অথচ খোলামেলা জ্বালাময়ী বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন–এর পরিণাম তো আরো ভয়াবহ হতে পারে?

টিটো : তা পারে। আমি মনোনয়ন না পাওয়ায় সন্ত্রাসীরা মিছিল করেছে। জেলখানায় বসে উল্লাস প্রকাশ করেছে। তাতে কি? আমি হারতে চাই না। যদি কোনো বাধা আসে তা মোকাবেলা করার মানসিকতা নিয়েই মাঠে নেমেছি। কি হবে? লাশ পড়বে? পড়লে পড়বে! মরতে তো একদিন হবেই।

সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে জীবন্ত মৃত হয়ে থাকতে চাই না।

মামুন রহমান

কেবলই বিষোদগার!

নির্বাচনী সফরে চট্টগ্রাম ঘুরে গেলেন দেশের প্রধান দু'টি দলের দুই নেত্রী। নতুন কোনো আশাবাদ তারা জাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন সাধারণ জনমনে। এ নিয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন মহলে হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া... লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

১১ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা এবং ১৬ সেপ্টেম্বর বেগম খালেদা জিয়া তাদের দলীয় প্রার্থীদের সপক্ষে ভোট চাইতে গিয়ে পরস্পরের সমালোচনা এবং বিষোগারই করে গেলেন। অথচ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষিত হয় '৯৫ সালে। বিএনপি অথবা আওয়ামী লীগ কোনো দলই এই ঘোষণা বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ এ পর্যন্ত নেয়নি। এবার নির্বাচন পূর্ব প্রতিশ্রুতিতে এই ঘোষণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কিছু অঙ্গীকার দু'জনের কাছেই আশা করেছিলো চট্টগ্রামের জনগণ যা বাস্তবে দেয়া হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি মানেই ফাঁকাবুলি– আবারো প্রমাণিত হলো।

চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড ময়দানে ১১ সেপ্টেম্বর বিকেলে শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম-৯ আসনের প্রার্থী এমএ মান্নানকে নির্বাচিত করবার জন্যে ভোট চাইলেন। অথচ চট্টগ্রামে '৯৬-এর নির্বাচনেও মাত্র ৫টি আসন আওয়ামী লীগ পেয়েছিলো বলে মন্ত্রিসভায় প্রথম দিকে চট্টগ্রামের কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। পরে চট্টগ্রাম-১ থেকে নির্বাচিত ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং চট্টগ্রাম-৯ থেকে নির্বাচিত এমএ মান্নান মন্ত্রিত্ব পান। তবে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার তারা কতটা করেছেন সেটিও প্রশ্নসাপেক্ষ। যে কারণে এবার প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক চেতনার দাবিদার আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকারে চট্টগ্রাম নিয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা আশা করে হতাশ হয়েছে চট্টগ্রামের প্রগতিশীল অনেকেই। চট্টগ্রামের উন্নয়ন, বন্দর সমস্যা নিরসনে সত্যিকার ইচ্ছা হয়তো কারোই নেই।

১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে লালদীঘি ময়দানে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিষোদগারের সাথে ঘোষণা করলেন পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক রাজধানী ও কম্পিউটার সিটি করবেন চট্টগ্রামকে। উপস্থিত অনেককে বারবার প্রশ্ন করতে শোনা যায়– এই দুটি অঙ্গীকারের কোনোটিই তো পরিষ্কার হলো না!

'৯৬-এর নির্বাচনে বিএনপি ১০টি আসনে জিতলেও সে সব আসনের প্রার্থীদের অনেকেই এলাকায় জনবিচ্ছিন্নতার কারণে নড়বড়ে অবস্থানে। ফলে তাদের জন্যেও এবার নির্বাচিত হওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আন্তরিক প্রতিশ্রুতি এবং প্রচারণা বিএনপি'র চেয়ে আওয়ামী লীগের জন্যে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হতো বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

সেনাকল্যাণ ভবনে বুলডোজারের আঘাত

দখলমুক্ত হচ্ছে বুড়িগঙ্গা

অবশেষে একদা খরস্রোতা নদী বুড়িগঙ্গা দখলমুক্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ নানা প্রতিকূলতার মাঝেও চালিয়ে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গার উদ্ধার অভিযান। তারা বুলডোজার দিয়ে আঘাত হেনেছে নদী দখল করে নির্মিত সেনা কল্যাণ ভবনের ওপর। আঘাত হেনেছে আলোচিত আলম টাওয়ার ও খাজা ভবনে। উদ্ধার করেছে সাবেক এমপি হাজী সেলিম কর্তৃক দখলকৃত বস্তির জায়গা।

একদা খরস্রোতা বুড়িগঙ্গা নদী স্বাধীনতার পর নানা মহল দখল করতে শুরু করে। গড়ে তোলা হয় নানা ধরনের স্থাপনা। বুড়িগঙ্গাকে অবৈধ দখলদারমুক্ত করতে '৯৬ সাল থেকে পরিবেশবাদীরা শুরু করে আন্দোলন। বুড়িগঙ্গাকে অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিত করতে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জরিপ পরিচালিত হয়। '৯৭ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রথম জরিপটি পরিচালনা করে। নদীর করুণ পরিণতির জন্য ১৩৩টি স্থাপনা চিহ্নিত করে। এসব অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের তালিকায় রয়েছে রাজনৈতিক নেতা, সামরিক ও বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি আড়তদার। বুড়িগঙ্গাকে দখলমুক্ত করতে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ল'ইয়ার এসোসিয়েশন (বেলা) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করে। রায়ে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুড়িগঙ্গা উচ্ছেদের অ্যাকশন প্ল্যান হাইকোর্টে জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। রায়ে বুড়িগঙ্গাকে দখলমুক্ত রাখতে সরকারকে নির্দেশ জারি করেন। হাইকোর্ট তিনবার এই নির্দেশ জারি করলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেননি। এ বছর এপ্রিল মাসে বেলার পক্ষ থেকে আদালত অবমাননার মামলা করা হয়। এরপরই বিআইডব্লুটিএ'র টনক নড়ে। ১৯ জুলাই থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে।

বুড়িগঙ্গা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবার পড়েই বিআইডব্লুটিএ নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে। দখলদার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিম্ন আদালত থেকে ইনজাংশন নিয়ে আসতে থাকে। নিম্ন আদালতের স্থিতাবস্থার কারণে বিআইডব্লুটিএ উচ্ছেদ অভিযান থমকে দাঁড়ায়। এ মাসের প্রথম দিকে তারা দ্বিতীয় দফা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। আলম টাওয়ার ও খাজা ভবনে আঘাত হানে। ১৫ সেপ্টেম্বর বিআইডব্লুটিএ সেনা কল্যাণ সংস্থা ভবন ভাঙার কাজ শুরু করে। সেনা কল্যাণ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাধা দেয়। সেনা কল্যাণ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ব্রিগেডিয়ার (অব:) আবুল হাশেম খান ও উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক লে. কর্নেল ফরিদ উদ্দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার অভিযানে বাধা দেয়। ব্যর্থ হয়ে তারা বিআইডব্লুটিএ কর্তৃপক্ষকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ভবন ঠেকাতে এগিয়ে আসে চারদলীয় জোটের প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমেদ। বিআইডব্লুটিএ কর্তৃপক্ষকে তিনি অভিযান বন্ধ করতে বলেন। এ সময় বিআইডব্লুটিএ কর্তৃপক্ষ কিছু সময়ের জন্য উদ্ধার অভিযান বন্ধ রাখে। পরে আবারও চলে উচ্ছেদ অভিযান। সরেজমিনে বুড়িগঙ্গা গিয়ে দেখা গেছে সেনাকল্যাণ সংস্থা ভবনের সত্তর শতাংশই ভেঙে ফেলা হয়েছে। অনেক বড় স্থাপনা অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থা ভেঙে ফেলেছে। বুড়িগঙ্গা পানিও বর্ষার কারণে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। বুড়িগঙ্গা কিছুটা হলেও ফিরে পেয়েছে তার হারানো যৌবন।

ঢাকা মহানগরের প্রাণের স্পন্দন বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা না বাঁচলে ঢাকা বাঁচবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বুড়িগঙ্গা উচ্ছেদের এ অভিযান সত্যিই প্রশংসিত। দলীয় সরকারের পক্ষে এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তো। পরিবেশবাদীরা আশা করছে, বুড়িগঙ্গা সম্পূর্ণ দখলমুক্ত হবে। বুড়িগঙ্গার দু'পারে গাছ লাগানোর পরিকল্পনাও সফল হবে। আগামীতে ঢাকাবাসী আবারও ঘুরতে যাবে বুড়িগঙ্গায়।

জয়ন্ত আচার্য

আবার ডাবল মার্ডার

চট্টগ্রামে গত ১২ সেপ্টেম্বর বুধবার রাত পৌনে ১১টায় সন্ত্রাসীর গুলিতে নিহত হয় সেন্ট্রাল প্লাজা ব্যবসায়ী সমিতির নবনির্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক আবুল কাশেম এবং আবু তাহের। ট্যাক্সি থেকে নেমে দু'জন সন্ত্রাসীর অতর্কিত গুলি স্তব্ধ করেছে যে দুটি জীবন– এদের মৃত্যু নিয়ে এখনো রহস্য রয়ে গেছে। ঘটনার ৪০ ঘন্টা পর কোতোয়ালী থানায় মামলা দেয়া হয় পুলিশের চাপে।

আবুল কাশেম সাবেক ছাত্রলীগ ক্যাডার। গত দু'বছর সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে ব্যবসা এবং সংসার নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। নির্বাচনের আগে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে আজমীর শরিফ জেয়ারত করবার কথা তাদের। তাকে টার্গেট করেই খুনিরা এসেছে– এ মন্তব্য প্রত্যক্ষদর্শীদের। আবু তাহেরকে গুলি করতেই অস্ত্রধারীর পাশের জন দেখিয়ে দেয়– সে নয়, কাশেমই টার্গেট।

পুলিশের মতে, জায়গা-জমি সংক্রান্ত আত্মগোপনে থাকা ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে অথবা বিয়ে সংক্রান্ত কোনো জটিলতা– এই তিন কারণের একটি দায়ী ডবল মার্ডারের পেছনে। তবে ভাড়াটে খুনির দ্বারা এ হত্যাকান্ড, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ পুলিশ প্রশাসন। আবুল কাশেমের দোকানে হবু স্ত্রীর সাথে টেলিফোনে কথা বলতে এসেছিল বেসরকারি শিপিং-এর কর্মকর্তা আবু তাহের। টুইন টাওয়ারের বিমান হামলার খবর শুনে আমেরিকা প্রবাসী স্ত্রীর খবর নিতে গিয়ে নিহত হলেন নিরীহ সুদর্শন আবু তাহের। বড় করুণ জীবন কাহিনী তাহেরের। শৈশবে মাতৃহারা তাহের টিউশনি করে প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে। সুন্দর জীবন শুরুর আগেই সব শেষ।

আবুল কাশেম সন্ত্রাসের কাছে এক সময় বিকিয়ে দিয়েছিলো নিজেকে। সব ছেড়ে ভালো হতে চাইতেই সন্ত্রাস কেড়ে নিলো আবুল কাশেমকে। ছাত্রলীগের দাবি ৮ হত্যার আসামি সাজ্জাদ হাবিব এই খুন করেছে। এই সন্দেহও পুলিশের বিবেচনাধীন। হতে পারে এমইএস কলেজের শক্তিশালী ক্যাডার গ্রুপের নেতা সুশীল দে, দুলুর সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী কাশেমকে হত্যা করলে পথের কাঁটা সরে যায় এ আশায় ঘটানো হয়েছে এ হত্যাকান্ড।

সন্তু লারমার সংবর্ধনা

গত ১৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ, চুনারুঘাট ও চান্দপুর-এর বাংলাদেশ চা শ্রমিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চান্দপুর চা বাগান ময়দানে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে হবিগঞ্জ-১ আসনে আদিবাসী নেতা ইয়াকুব আলী এবং হবিগঞ্জ-৪ আসনে পন্ডিত রবি দাস স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী লেখক (বাঁ থেকে) সঞ্জীব দ্রং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল, সন্তু লারমা, সাবেক এমপি নোয়ার আলী আব্বাস এবং গণফোরাম নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য। আদিবাসী লেখক সঞ্জীব দ্রং হবিগঞ্জ-১ ও হবিগঞ্জ-৪ আসনে আদিবাসী ফোরাম মনোনীত প্রার্থী যথাক্রমে পন্ডিত রবি দাস ও ইয়াকুব আলীকে প্রতীক তীর-ধনুক উপহার দিয়ে উপস্থিত জনগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

এ সপ্তাহের বিশ্ব

কাবুলে রকেট হামলা

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার কয়েক ঘন্টার মধ্যে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার গানশিপ হতে রকেট হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় আফগান রাষ্ট্রীয় এয়ারলাইন্স 'আরিয়ানা'র একটি যাত্রীবাহী জেট বিমানসহ তিনটি বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তালেবান বিরোধী নেতা ওয়াইয়াউদ্দিন মালিক হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। এদিকে আত্মঘাতী বোমা হামলায় আহত তালেবান বিরোধী নেতা আহমেদ শাহ মাসুদ মৃত্যুবরণ করেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে একটি মার্কিন পত্রিকা এ খবর দিয়েছে। মাসুদ মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বর্ণবাদ বিরোধী সম্মেলনে মতৈক্য

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত বর্ণবাদ বিরোধী সম্মেলনে দাসপ্রথা নিয়ে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো একটি মতৈক্যে পৌঁছেছে। দীর্ঘ বাদানুবাদের কারণে সম্মেলনটি অতিরিক্ত দিনে গড়ায়। অবশেষে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশসমূহ এবং আফ্রিকার দেশগুলো ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সম্মেলন দাসত্ব ও দাস ব্যবসাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে স্বীকার করবে। এছাড়া দায় স্বীকার করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেবে। তবে এই সহায়তা ঋণ মওকুফ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন হিসেবে প্রদান করা হবে। তাছাড়া এজন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যাবে না।

জেনিনে ইসরাইলি তান্ডব

যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা জোরদার করেছে। বুধবার জেনিন এবং পার্শ্ববর্তী দুটি গ্রামে ট্যাংক ও হেলিকপ্টার গানশিপের হামলায় ৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়। দ্বিতীয় দিনে আরও ৫ জন নিহত হয় এবং আহত হয় প্রায় ২০ জন। এ সময় ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসিত শহরটিতে স্থানীয় সরকারের দপ্তর গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া জেরিকো শহরে ২০টি ট্যাংক ও বুলডোজারের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে বিমান হামলার পর উল্লাসরত ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালালে ৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়।

হাসান মূর্তাজা